ওয় মত

‘ওয়ান বাংলাদেশ’ রূপকল্প বাস্তবায়িত হোক

বর্তমান সরকার এ দেশের প্রযুক্তিপ্রেমীদের কাছে প্রযুক্তিবান্ধব সরকার হিসেবে খ্যাত। কেননা, এ সরকার তার প্রথম শাসনামলে অর্থাৎ ১৯৯৬-০১ সালে কমপিউটারের ওপর আরোপিত কর ও শুল্ক প্রত্যাহার করে নেয়, তথ্যের মহাসাগর ইন্টারনেট ব্যবহারের অনুমোদন দেয়, দেশে প্রতিবছর ১০ হাজার প্রোগ্রাম তৈরি করার ঘোষণা দেয়, যা বাস্তবায়ন করতে প্রাথমিকভাবে ব্যর্থ হয়। এসব ক্ষেত্রে রাতারাতি সফলতা আশা করা যায় না ঠিকই, তবে এসব লক্ষ্য হাসিলের জন্য কিছু কাজ শুরু করা হয়েছিল তবে আশানুরূপভাবে কাজের গতি যে ছিল, তা বলা যাবে না কোনোভাবেই।

এই সরকারই ২০০৭-১২ মেয়াদে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ঘোষণা করে, যা তরুণ সমাজকে ব্যাপকভাবে নতুন স্বপ্নে বিভোর করে তোলে। এ সময় সরকার আরও ঘোষণা দেয়, ২০২১ সালের মধ্যে দেশ হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ নিজেকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করে নিজের অর্থনীতির ভিত মজবুত করবে। এ লক্ষ্য হাসিল করার জন্য যথেষ্ট কাজ হচ্ছে, তবে যে গতিতে কাজ হচ্ছে তাতে নিশ্চিত করে বলা যায়, সরকার ঘোষিত এ লক্ষ্যও যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না কোনোভাবেই।

এ ধরনের ব্যর্থতা বা সময়ের কাজ সময়ে শেষ না হওয়ার দৃষ্টান্ত সরকারি সেক্টরে রয়েছে ভূরি ভূরি। বলা যায়, প্রায় সময় সরকারের প্রতিশ্রুত শতভাগ কাজই ঠিক সময়মতো সম্পন্ন হয় না। কিন্তু এর ফলে সাধারণ জনগণ যে তীব্র ক্ষুব্ধ হবে বা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তেমনটি কখনই ঘটতে দেখা যায়নি।

কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরে এমন ঘটনা কখনই ঘটে না। সম্প্রতি বাংলাদেশের সফটওয়্যার ও আইটি শিল্পের রূপকল্প উদ্বোধন করা হয়। আগামী পাঁচ বছরে ১ বিলিয়ন ডলার রফতানি, ১ মিলিয়ন পেশাদার আইটি জনশক্তি তৈরি, প্রতিবছর এক কোটি মানুষকে ইন্টারনেট ব্যবহারের আওতায় আনা এবং জিডিপিতে সফটওয়্যার ও আইটি খাত থেকে ১ শতাংশ অবদান রাখার লক্ষ্যে ওয়ান বাংলাদেশ ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়।

সফটওয়্যার ও আইটি শিল্পের ‘ওয়ান বাংলাদেশ’ রূপকল্প অর্জনের মধ্য দিয়ে ২০২১ সালে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ রূপকল্প অর্জন সম্ভব হবে এবং আমাদের দেশে ১০ কোটি তরুণ-তরুণী কাজ করে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশ নয়, উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত করবে।

যেকোনো কাজ বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতি দেয়া খুব সহজ, কিন্তু বাস্তবায়ন করা মোটেও কঠিন কোনো কাজ নয়, যদি থাকে কাজে আন্তরিকতা এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। সততার সাথে কঠোর চেষ্টা করলে এমন রূপকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। তবে এর জন্য এখন থেকে আমাদেরকে আন্তরিকভাবে এ লক্ষ্য হাসিলে কাজ করতে হবে। অতীতেও আমরা অনেক প্রতিশ্রুতির কথা শুনেছি, যেগুলোর কোনো কোনোটি হয়তো বাস্তবায়িত হয়েছে, তবে কখনও প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে হয়নি। আমরা চাই এ ক্ষেত্রে যেনো অতীতের ব্যতিক্রম হয়, অর্থাৎ যথাসময়ে ‘ওয়ান বাংলাদেশ’ রূপকল্প বাস্তবায়িত হবে।

কাজী ফিরোজ

পাঠানতুলী, নারায়ণগঞ্জ

চাই ই-বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা

আমি গত কয়েক বছর ধরে কমপিউটার জগৎ পত্রিকাটি নিয়মিতভাবে পড়ে আসছি। আমি যেহেতু বিজ্ঞানের ছাত্র এবং কমপিউটারের প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে, তাই আমি কমপিউটার জগৎ পত্রিকার আলোচনাধর্মী লেখাগুলোর চেয়ে টেকনিক্যাল বিষয়ের লেখাগুলো বেশি পড়ে থাকি। তবে আলোচনাধর্মী লেখাগুলো যে একেবারেই পড়ি না তা নয়, কিছু কিছু নন-টেকনিক্যালও লেখা পড়ি। মার্চ মাসে কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত এমনই একটি নন-টেকনিক্যাল লেখার শিরোনাম ছিল ই-বর্জ্য পরিবেশের হুমকি।

এ লেখা পড়ে মনে হলো আমার মতো অনেক ব্যবহারকারী আছেন, যারা দীর্ঘদিন ধরে কমিপউটার, আইসিটিসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পণ্য এবং বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য ব্যবহার করে আসছেন মনের মধ্যে এক ভুল ধারণা আঁকড়ে ধরে। এই ভুল ধারণা হলো আইসিটি পণ্য স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য তেমন ক্ষতিকর নয়, তা ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত যাই হোক না কেনো। আর তাই আমরা খুব অসচেতনভাবে পুরনো অব্যবহৃত কমপিউটার বা ইলেকট্রনিক্স পণ্য যেখানে-সেখানে ফেলে দিতে কিংবা বিভিন্ন ফেরিওয়ালার কাছে নাম মাত্র দামে বিক্রি করতে কুণ্ঠাবোধ করি না। সত্যি কথা বলতে গেলে বলা যায়, ই-বজ্য কী? কীভাবে ই-বর্জ্য সৃষ্টি হয় এবং ই-বর্জ্যের ক্ষতিকর প্রভাব কী তা আমি এবং আমার মতো বেশিরভাগ ব্যবহারকারীই জানেন না।

আমার ধারণা ছিল না যে ই-বর্জ্য বা ই-ওয়েস্ট টার্ম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে বিশ্বে এক আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে। আমার ধারণা ছিল না যে ই-বর্জ্যের তালিকায় থাকতে পারে টিভি, কমপিউটার, মোবাইল ফোন, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েব ওভেন, ইলেকট্রনিক্স খেলনা, হোম এন্টারটেইনমেন্ট, সার্কিটারি সংবলিত বিজনেস আইটেম, বৈদ্যুতিক শক্তি, ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেটসহ ব্যাটারির মতো অসংখ্য পণ্য।

এ কথা ঠিক যে, ই-বর্জ্য সৃষ্টিকারী শীর্ষে থাকা দেশগুলোর তুলনায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি, এ জন্য গর্ববোধ করা উচিত হবে না। আমাদের ই-বর্জ্য কম সৃষ্টি করার পেছনের কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো, আমাদের দেশে আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় তেমন উন্নত নয়। এর ফলে আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ একটি আইসিটি পণ্যকে একেবারে ব্যবহারের অযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করতে থাকেন। এ ছাড়া আর্থিক কারণেই কোনো আইটি পণ্যকে রাতারাতি বদলে ফেলার মন-মানসিকতা হাতেগোনা গুটিকয়েক ব্যবহারকারীর রয়েছে। আমাদের দেশে ই-বর্জ্য যে কারণে সৃষ্ট হোক না কেনো এবং যত কমই হোক না কেনো, ই-বর্জ্যের কারণে আমরা তুলনামূলকভাবে একটু বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকব।

স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাবের কারণে আমাদের দেশের জনসাধারণ বেশি পরিমাণে ঝুঁকি ও বিপদের মধ্যে থাকবে। কেননা, আমাদের দেশে ই-বর্জ্য খুবই অসতর্ক ও অসচেতনভাবে যেখানে-সেখানে উন্মুক্ত স্থানে, আবর্জনার স্তূপে ফেলা হয়। আমাদের দেশে ভাঙা-পুরনো জিনিসপত্র সংগ্রহকারীরা বিভিন্ন ধরনের বর্জ্যের সাথে সাথে ই-বর্জ্যও কুড়িয়ে নিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এদের মধ্য থেকে কেউ কেউ ময়লা-আবর্জনা থেকে মূল্যবান ধাতু সংগ্রহের জন্য শক্তিশালী অ্যাসিড ব্যবহার করে খুবই অসতর্ক ও অসচেতনভাবে। সরকার ও সিটি কর্পোরেশনের অনুমতি না নিয়ে অনেকটা অবৈধভাবে এ কাজগুলো তারা করছে। কোনো ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করেই এ কাজগুলো করা হয়। এতে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব যেমন পড়ে, তেমনি কর্মরত এসব কর্মী বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় ভোগে।

আমাদের উচিত এসব কর্মীকে ই-বর্জ্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা। প্রয়োজনে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে, তবে কোনো অবস্থাতেই এসব কাজ নিষিদ্ধ করা উচিত হবে না। কেননা এতে বিপুল সংখ্যক কর্মী বেকার হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করবে, কিংবা বিভিন্ন ধরনের অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে। সুতরাং আমরা চাই সরকার ও আইসিটিসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠনগুলো ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সঠিক পদক্ষেপ নেবে এবং এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করবে।

জহির উদ্দিন

মিরপুর, ঢাকা

কারুকাজ বিভাগে লিখুন

KviæKvR wefv‡Mi Rb¨ †cvMvg I mdUIq¨vi wUcm ev UwKUwK wj‡L cvVvb| †jLv GK Kj‡gi g‡a¨ n‡j fv‡jv nq| mdU Kwcmn †cvM‡gi †mvm †Kv‡Wi nvW Kwc cvZ gv‡mi